লন্ডন নাহয় না-ই হল

Jawhar Sircar

কলকাতা লন্ডন কবে হবে জানি না। কিন্তু কলকাতা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ছেঁড়া-ন্যাকড়া রাজধানী হওয়ার কলঙ্কচিহ্ন থেকে মুক্তি পায়, এটুকু তো আমরা চাইতে পারি। একেবারে নির্জন কয়েকটি রাস্তা বাদ দিলে এই মহানগরের কোনও একটি ফুটপাত-ও নেই, যেখানে এই বিগত কয়েক বছরে সকলের চোখের সামনে হকাররা দখল করেননি। গড়িয়াহাট-রাসবিহারী, নিউ মার্কেট-এসপ্ল্যানেড বা বিধান সরণির কথা বলছি না। ওখানে তো কত ঐতিহ্য আছে— সেই প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় আর সুভাষ চক্রবর্তীর 'অপারেশন সানশাইন'-ও আমরা দেখেছি। হটিয়ে দেওয়ার পর নতুন স্টল যখন বসে, শুধু পাড়ার লিডার আর পুলিশের রেট বেড়ে যায়।

বরং, বলি অন্য বড় ছোট রাস্তার সদ্য ইতিহাসের কথা। এক বর্গ ফুট-ও দখল থেকে রেহাই পায়নি সেই সব রাস্তা। এত বৃহৎ ফুট-দখল রাজশক্তির মহান ঔদার্য ছাড়া অসম্ভব। এও নিশ্চয়ই আমজনতাকে সাহায্য করার পরিকল্পনা। যখন দশকের পর দশক বাংলায় কোনও চাকরিই নেই, এটাই নিশ্চয়ই সবচেয়ে ফলপ্রসূ কর্মসংস্থান স্কিম।

সাধারণ মানুষ সস্তায় জিনিস কিনতে চান, অতএব বিমর্ষতা বা হতাশার খুব একটা অবকাশ নেই। আর তার উপর আছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর মোহর ও দাক্ষিণ্য— তাঁর 'স্ট্রিট ভেন্ডার স্কিম'। যে হকাররা হকারের তালিকায় স্থান পান, তাঁরা আজীবন দখল সার্টিফিকেট ও উত্তরাধিকার শর্তও পান।

অবশ্য, সাধারণ মানুষ কোথা দিয়ে হাঁটবেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হোঁচট খেয়ে পড়লে তো আছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাগুলি মেরামতে ক'লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে আমরা কোনও দিনই জানতে পারব না, কিন্তু আমরা দেখি কী করে একটু বৃষ্টিতেই ওই রাস্তাগুলির আলকাতরা গলে যায় আর বিটুমিন গড়াগড়ি খায়। আবার টেন্ডার হবে, আবার কন্ট্রাক্টরবাবু তাঁর রোড-রোলার আর কাজের লোক নিয়ে পৌঁছে যাবেন। এস ওয়াজেদ আলির ভাষায় "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।"

হ্যাঁ, একটা কথা না বলে পারছি না। প্রচুর গরিব ও সাধারণ মানুষ এই ফুটপাতের দোকানে ভাত-ডাল তৈরি করে আর খেয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু এই দোকানগুলি যে স্বল্প জলে তাদের থালা-বাসন ধোয়াধুয়ি করে, তাতে যে কোনও সময় তাঁদের টাইফয়েড কলেরা আর অন্ত্রের জ্বর হতে পারে। এত যখন পরিকল্পনা করে দিয়েছেন, আর একটা করা যায় না? যার সাহায্যে পুরসভাগুলি কাছাকাছি একটু পরিষ্কার জলের নল লাগাতে পারে, আর নোংরা জল সরাসরি রাস্তার নালায় চলে যায়? ফুটপাত যখন পাবই না, অন্তত সাধারণ নাগরিকরা পেটের রোগ থেকে বাঁচুক।

কয়েকটি হকারস্থলে আগুন লাগার ঘটনার পর স্বয়ং নগরপাল মহোদয় নিজে পরিদর্শন করে স্টলগুলির প্লাস্টিক আর পলিরোল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর পর বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ওই দোকানগুলির দুই পাশে ও ছাদে টিনের কাঠামো বাধ্যতামূলক করেন। আর অনেক এলাকায় তা লাগিয়ে ছাড়েন। কিন্তু দোকানগুলির রাস্তামুখী পিছনের দিকের জন্যে কোনও ফরমান দিলেন না। ফলে, প্রায় সব হকার এই সবচেয়ে বেশি নজরকাড়া অংশটিকে যেন তেন প্রকারেণ ঢাকেন। বাড়ির পুরনো ছেঁড়া বেডকভার, জোড়া-দেওয়া নোংরা কাপড় বা শাড়ি দিয়ে কাজ চালান। ফলে কলকাতা হয়ে উঠেছে ছেঁড়া ন্যাকড়ার লন্ডন।

আসা যাক শহরের পার্ক আর বাচ্চাদের খেলার মাঠের দিকে। আমরা যে সব খোলা জায়গায় খেলা করতাম, তার তো একটাও বেঁচে নেই বললেই চলে। এই রাজ্যের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হল বাড়ি নির্মাণ বা প্রোমোটারের কাজ। সকলেই জানেন যে, কোনও স্থানীয় নেতা আজ বাকি নেই, যিনি এর থেকে প্রচুর টাকা অর্জন করেননি, বা বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাটের মালিক হননি। প্রতিটি পার্ক যে ভাবে পুরসভা তার পরিকাঠামোর জন্যে দখল করে নিয়েছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

অনেক বার বলার পর নগর নিগম কয়েকটি এলাকায় এই দোকানগুলির পিছন দিকে বোর্ড লাগাল। তাতে অবশ্যই শোভিত মুখ্যমন্ত্রীর অসংখ্য সাহায্য প্রকল্পের বিজ্ঞাপন, আর তাঁর নিজের মুখের নানা ছবি। সে সব বোর্ড নান্দনিক কি না সে প্রশ্ন নিশ্চয় প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুতর প্রশ্ন— কেন এখনও বেশির ভাগ রাস্তা দিয়ে গেলে দেখা যায় জীর্ণ ও ময়লা কাপড়ের স্তূপ। নিশ্চয়ই কিছু বিকল্প ভাবনা ভাবা যায়? কলকাতা যদি সত্যিই ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হয়, তবে নিশ্চয় এখানকার চিত্রকরদের কাজে লাগানো যায়? পাড়ায় পাড়ায় 'এঁকে দেখাও' প্রতিযোগিতা করা যায়? যে সব দুর্গাপুজোর ক্লাব এমনিতেই প্রচুর টাকা জোগাড় করে, তাদের সেই বহুবিতর্কিত সরকারি অনুদানের অন্তত কিয়দংশ দিয়ে পাড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কথা বলা যেতে পারে নিশ্চয়ই? কিংবা, বাণিজ্যিক সংস্থার মারফত এই ধরনের অভিযান করার কথা ভাবা যেতে পারে। ঠিক যেমন, কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাদের জাংশন বক্সগুলিকে সুসজ্জিত করেছে।

স্ট্রিট আর্ট-এর ক্ষেত্রেও কলকাতা তার বিশেষ উদ্দীপনা দেখাতে পারে না কি? মহানগরের অনেক স্থানে চোখে পড়ে কালো আর নীল প্লাস্টিকে ঢাকা কত বসতি। এই গৃহহীন লোকেরা কারা ঠিক জানি না, কিন্তু সরকারকে একটি ছোট্ট আবেদন করব যে, ওঁদের বাসস্থানকে একটু স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আমরা হয়তো লন্ডন হতে পারব না, কিন্তু তা-ই বলে সারা শহরটিকে এমন বিশাল একটি কুদর্শন বাসস্থানে পরিণত করারও তো দরকার নেই? এ রাজ্যের শাসকরা এক বার চোখ মেলে দেখুন, গোটা কলকাতা জুড়ে কত কুশ্রী এলাকা। ভারতের অন্যান্য ঝকঝকে শহরের সঙ্গে তুলনা করলে কিন্তু দেখে দুঃখে মুষড়ে পড়তে হবে।

আমি থাকি প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের একডালিয়া স্ট্রিটের ঠিক উল্টো দিকের অঞ্চলে। সুব্রতবাবু রেগে যেতেন ওঁর সামনে গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নীচে আবর্জনা বাছাইকারীদের নোংরা জিনিসপত্র দেখে। উনি চলে গেলেন, কিন্তু তাঁরা যে কে সে-ই রয়ে গেলেন। সেখানে তাঁদের জন্যে কয়েকটি আলমারি বা তালামারা বাক্স বসিয়ে দিলেই কিন্তু জায়গাটা অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে যেত। জানি না, আমাদের শাসকেরা এই কয়েকটি ছোট কাজ না-করে বিশ্বের বড় শহরের স্বপ্ন দেখান কেন।

আসা যাক শহরের পার্ক আর বাচ্চাদের খেলার মাঠের দিকে। আমরা যে সব খোলা জায়গায় খেলা করতাম, তার তো একটাও বেঁচে নেই বললেই চলে। এই রাজ্যের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হল বাড়ি নির্মাণ বা প্রোমোটারের কাজ। সকলেই জানেন যে, কোনও স্থানীয় নেতা আজ বাকি নেই, যিনি এর থেকে প্রচুর টাকা অর্জন করেননি, বা বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাটের মালিক হননি। প্রতিটি পার্ক যে ভাবে পুরসভা তার পরিকাঠামোর জন্যে দখল করে নিয়েছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। বাচ্চারা খেলবে কোথায়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই বা একটু হাওয়া খেতে যাবেন কোথায়? মুম্বইয়ের নানা-নানী পার্ক দেখলে কলকাতার জন্য কষ্ট হয়। লন্ডন চাই না, শুধু ওই পার্কগুলি ফেরত চাই।

দিনে দু'বার রাস্তার আবর্জনা তোলা হয় ঠিকই, কিন্তু সন্ধে-রাতে আবার জমে যায় রাস্তায়, যেখানে ইঁদুর ছুঁচো আরশোলাদের টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলে। হয় পুরনিগম দোষী বাসিন্দাদের উপর কড়া জরিমানা বসাক, নয়তো রাত্রে আর এক দফা সাফাইয়ের অভিযান হোক। রাতের এই কুৎসিত ডাঁইগুলি আর সহ্য হচ্ছে না।

রাতের কথা বলায় মনে পড়ল হাসপাতালগুলির অবস্থা। সমস্ত সরকারি হাসপাতালের বড় বড় ইউরোপীয় শৈলী গেট-গুলি অনেক শহরকে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু দিনের বেলার রোগীদের আর তাঁদের পরিবারের লোকেদের যে ভাবে চড়া রোদে আর ভারী বৃষ্টির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তা দেখলে ওই রাজকীয় গেটের গৌরব বাতাসে উড়ে যায়। আর রাতের কথা সকলেই জানেন। হাজার হাজার লোককে কী করুণ ভাবে লম্বা পিচবোর্ড-এর বা ফ্লেক্সের টুকরোর উপর শুয়ে থাকতে হয়, পরের দিনে ডাক্তার দেখানোর জন্য। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিজে এক বার রাতে হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, যেখানে কান পাতলেই শোনা যাবে জনতার তীব্র কিন্তু চাপা আর্তনাদ!